ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1179-1184
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.337

সুরথনাথ থেকে কালকূটের যাত্রাপথ

সুমন্ত দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Samaresh Basu transform his real name to pseudonymous which represents a complex negotiation between realism, political expressionism and creative rejuvenation. Basu famously adopted pseudonym 'Kalkut' to explore theme distinct from his realist social fiction. Under this pseudonym Samaresh Basu various philosophical narratives and introspective works moves beyond strict social realism ontology. Further basu's narrative voice exponentially shifts from extreme political to the existential or living crisis which demonstrates how the pen name allowed Samaresh Basu to reconstruct his literary identity at large. Thus, this article tries to highlight how the literary identity of Samaresh Basu has exponentially shifted as well as ornamentally enriched efficacy of pseudonym as 'Kalkut' has been engraved to his original names or pseudonym. Besides by adopting multiple pen names or pseudonyms Samaresh Basu effectively creates parallel narrative selves which portray distinct dimension of Bengali society. i.e. it's long political struggle, spiritual quest and sexual subjectivity.

Keywords: Surathnath, Samaresh, Pseudonym, Kalkut, Vote Mirror

বাংলা সাহিত্যের ধারা বহতা নদীর মতো সুদূরপ্রসারী। এই বহতা নদীর প্রাণ-প্রবাহধারাকে ত্বরান্বিত করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুরথনাথ বসু ওরফে সমরেশ বসু (১১.১২.১৯২৪–১২.০৩.১৯৮৮)। একেবারে রূপকথার নায়ক বলতে যা বোঝায় সমরেশ বসু তাই। স্কুল পালানো, এক সংসার ত্যাগ করে গৌরী দেবীকে সঙ্গী করে আরেক সংসারের কর্তা হওয়া, লেখক জীবন শুরু করা,– শুধু লেখার মধ্যে ডুবে থাকার জন্য কখনো ডিম ফেরি তো কখনো বন্দুক কারখানায় কাজ করে দারিদ্রের সঙ্গে হরদম লড়াই, জীবনবোধের দর্শন, সাহিত্যজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে এককালীন থেকে চিরকালীনের নায়করূপে প্রতিপন্ন করে চলেছে আজও প্রতিনিয়ত। ব্রত চক্রবর্তীর সমরেশ স্মৃতিচারণা (অন্তরীপ, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা, সাত–দশ) অন্তত তারই সাক্ষ্য দেয়– পাঞ্জাবি ড্রাইভার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, "খোকাবাবু, উস আদমী কোনো ফিল্ম স্টার আছে?" আবার একই কথা আমরা সম্প্রতি দেশ বইসংখ্যা (প্রথম প্রকাশ ১৭ জানুয়ারি ২০২৪) ২০২৪ এ অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা 'অমৃতের উত্তরাধিকার' প্রবন্ধের শুরুতেও লক্ষ করি। সমরেশ বসুর নায়কোচিত এই ক্যারিশ্মাটিক ব্যক্তিত্বের পেছনে রয়েছে এক গভীর সাধনা– সুরথনাথ থেকে সমরেশ, সমরেশ থেকে কালকূট ও পরবর্তীতে কালকূট থেকে ভ্রমর এবং বাংলা সাহিত্যের এক ডাকে চেনার মতো প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সাধনা।

ছদ্মবেশ ধারণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল আত্ম ব্যতীত অন্যদের তথা পাঠক, দর্শক ইত্যাদি শ্রেণিবর্গের কাছে নিজেকে গোপন করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন। ম্যাজিশিয়ান থেকে শুরু করে লেখক, অভিনেতা, থিয়েটারকর্মী, বহুরূপী প্রভৃতি বহু ভিন্ন পেশার মানুষেরা নানান সময় নানান দরকারে অদরকারে ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকেন। বহুরূপী কিম্বা নাট্যকারদের ছদ্মবেশ ধারণ তাদের শিল্প প্রকাশের একটি প্রকৌশল অথবা রুজি-রুটি কামানোর পথ। কিন্তু লেখকদের ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষেত্রে মুখ্য হয় তাদের গোপন অভিসন্ধি; প্রধানত সমাজের হীনকর অথবা বিকৃতকর ব্যবস্থার বিপক্ষে বিদ্রোহের সুর প্রতিধ্বনিত হয়। এই বিদ্রোহের সুরে চটে যায় সরকার; রাষ্ট্র। তারা নিজেদের দোষ, ত্রুটি ইত্যাদির সমালোচনা শুনে নিজেদের শুধরে নেওয়ার পরিবর্তে চড়াও হয় উক্ত বিদ্রোহের তথা বিদ্রোহীর উপর। অবশ্য বাংলা সাহিত্যিকেরা প্রথমদিকে কোনরূপ রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক মত বিরোধিতা বা আইনী জটিলতাকে এড়িয়ে চলার জন্য ছদ্মনামের ব্যবহার করতেন– এমনটা নয়। নেহাতই শিল্পীরা যেভাবে মঞ্চনাম ব্যবহার করে থাকেন তারই অনুকরণে লেখকেরা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। হুতোম প্যাঁচা, কমলাকান্ত সহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিককার ছদ্মনামধারী লেখকদের ক্ষেত্রে অন্তত তাই মনে হয়। তবে সময় গড়ায়, সমাজ সচেতনতামুখী হয়। শাসকের শোষক হওয়াকে মেনে নিতে পারে না সংবেদনশীল সাহিত্যিকেরা। তারা মুঠো ভরে তলোয়ারের বদলে আঙুলের সাহায্যে তুলে নেয় কলম; চুরমার হয়ে যায় শাসকের মুখোশ, বেরিয়ে আসে রক্ত রঙের মুখ। কলমের আঁচড় নড়িয়ে দেয় শাসকের গদি, আর এই গদি হারানোর ভয় থেকে শাসক দমন করতে চায় সাহিত্যিকদের। এ থেকেই গা বাঁচিয়ে স্বপ্নসমাজ গড়তে লেখকেরা ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। 'গাহে অচিন পাখি' রচনায় সমরেশ বসু ছদ্মনাম ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, "...ছদ্মনামের প্রয়োজন হয়, নামের আড়াল থেকে নিজেকে ব্যক্ত করা।"[১] কথাসাহিত্যের আঙিনায় বিখ্যাত সমরেশ বসুর পিতৃদত্ত নাম সুরথনাথ বসু। বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তার নাম বদলে দেন,– সমরেশ বসু। অর্থাৎ সুরথনাথ থেকে সমরেশ ছদ্মনাম নয় আবার সমরেশ থেকে কালকূট ছদ্মনামের এক যাত্রাপথ। নাম বদলের পরেও ছদ্মনাম কেন নিতে হল সমরেশ বসুকে, এ নিয়ে আলোচনার অবকাশ থেকেই যায় আবার ছদ্মনামের যথার্থতা ছাদ্মিকে কতটা প্রকট করে তোলে তার বিশ্লেষণও অনুসন্ধিৎসু অধুনা গবেষকদের গবেষণার বিষয়। এখন প্রশ্ন হল, 'সমরেশ' নামটি এল কোথা থেকে? এ নিয়ে প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সমরেশ বসু নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, নরেশ সেনগুপ্তের কোনো গল্পের চরিত্রের নাম থেকে তাঁর নাম সমরেশ হয়েছিল। সুরথনাথের মূর্তিই পরবর্তীতে প্রতিমায় সমরেশ এবং কালকূট রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে।

ছদ্মনামের প্রাসঙ্গিকতা তার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে ছদ্মনাম গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রথমদিকে যতটা জোরালো থাকে পরবর্তীতে আর তার ততখানি গুরুত্ব নজরে আসে না। সেক্ষেত্রে ছদ্মনাম তার আবেদনক্ষমতা হারায়। কিন্তু সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে তাঁর ছদ্মনামের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি প্রথমেই হয়নি, হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। সমরেশ বসু ছদ্মনামে একটিমাত্র রাজনৈতিক লেখা লিখেছেন, 'ভোটদর্পণ'। আর তারপরেই তিনি জেনেছেন "বস্তুতপক্ষে কালকূট ভ্রমণবিলাসী নন— ভ্রমণ তার কাছে উপলক্ষ মাত্র।"[২] আসলে কালকূট একটা যাত্রাপথ। যে পথে একের পর এক নতুন নতুন মানুষের সংস্পর্শে এসে সমরেশ বসু কালকূট হয়ে উঠছেন অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর তাঁর নিজের লেখনীর মন্ত্রবলে। দিনের বেলা লুকিয়ে পোস্টার লিখে সেগুলো রাতের আঁধারে দেওয়ালে সাঁটা, কিম্বা শ্রমিকদের জমায়েতে বক্তৃতা দেওয়া সবই নিঃস্বার্থ ভাবে করেছেন তিনি। পার্টি অন্তঃপ্রাণ সমরেশ জেলও খেটেছেন। পড়াশুনার জন্য সময় তেমন পেতেন না। তবু লেখক হওয়ার তীব্র ইচ্ছেশক্তি তাঁকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিখাদ লেখক তৈরি করেছে। সমরেশ বসু জানাচ্ছেন,– "প্রায় চৌদ্দ ঘন্টা পর বাড়ি ফিরে, ক্লান্ত শরীরের লিখতে বসাটা প্রায় অসম্ভব মনে হলেও, ভিতরের উন্মাদনা কোন ক্লান্তিকেই মেনে

নিতো না।"[৩] এই 'ভিতরের উন্মাদনা'টাই জীবনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সাহিত্যিক রূপে গড়ে তুলতে পেরেছিল সমরেশ বসুকে। তিনি নিজে যা হতে চেয়েছিলেন, তা হতে পেরেছিলেন একমাত্র নিজের অদম্য জেদ ও স্ত্রী গৌরী দেবীর সহায়তায়। একটি জীবনের বড় হয়ে ওঠার পেছনে তার পারিপার্শ্বিক বহু মানুষের অবদান থাকে, এক্ষেত্রেও তা ই হয়েছে। ঢাকার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাজানগর গ্রামের সুরথনাথ বসু হয়ে ওঠেন বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম নাম, কালকূট।

২

মোহিনীমোহন বসু ও শৈবলিনী বসুর জীবিত চার সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান হলেন সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)। ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর মোহিনীমোহনের মাতুলালয়ে রাজনগরে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার সময় শৈবলিনী বসু জন্ম দেন সমরেশের। তড়িঘড়ি জন্ম নেওয়াতে সমরেশ বসুর ডাকনাম হয় তড়বৈরা। সমরেশ বসুকে ১৯২৮ এ গিরীশ মাস্টারের স্কুলে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে তিনি গণ্ডারিয়া ঢাকাতে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। শ্রী বসু পড়াশোনায় তেমন মেধাবী না হলেও ছবি আঁকা ও গান গাওয়াতে একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। পিতা মন্মথনাথ বসু লোকচিত্র আঁকতেন; তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন ছবি আঁকা। এছাড়াও ভক্তি ও তন্ত্রের প্রভাবের মূলেও ছিলেন পিতা। আর মা শৈবলিনী দেবীর কাছে ব্রতকথা ও পাঁচালীর শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। এছাড়া সমরেশ বসু অসাধারণ বাঁশি বাজাতেও পারতেন। টিকিট কালেকটর হামিদের বাড়িতে গানের আড্ডায় গান ভেজেছেন, বাঁশিতে জুগিয়েছেন অপূর্ব প্রাণ প্রবাহ ধারা। অর্থাৎ, সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির যা যা বৈশিষ্ট্য থাকে তার সবকটিই ছেলেবেলা থেকে সমরেশ পেয়েছিলেন পিতা-মাতা ও পারিপার্শ্বিকদের কাছ থেকে। প্রতিভা আসলে সবসময় জন্মগতই হয় এমনটা না, প্রতিভা কখনো কখনো কঠোর অনুশীলন ও একাগ্র মনে অধ্যাবসায়ের ফলেও সুতীক্ষ্ণ ও উপযোগিতা অনুযায়ী প্রখরতা লাভ করে। যার ফলে সমাজে বিছুরিত হয় সফলতার নতুন পথের সন্ধানে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি।

ছেটোবেলা থেকেই সমরেশ ছিলেন দুরন্ত। অষ্টম শ্রেণির রেজাল্ট বেরোনোর দুদিন আগে কলকাতায় মাসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য সমরেশ বসু একটি কাগজে কতকগুলো সংখ্যা বসিয়ে এনে বাড়িতে জানিয়েছিলেন, তিনি পাশ করেছেন। কিন্তু বিয়ে বাড়ি সেরে ফেরার পর আর রেজাল্ট আনতে যাননি। কাজেই তাঁর দাদাকে যেতে হল স্কুলে। সমরেশ বসু ততক্ষণে বেপাত্তা। দুষ্টুমির দৌরাত্ম্য সমরেশের বাল্যকালকে বেড়া দিয়ে রেখেছে। তাঁর দুরন্তপনাকে আয়ত্তে আনতে না পেরে পিতা মোহিনীমোহন বসু বড় পুত্র মন্মথনাথ বসুর কাছে ১৯৩৮ এ নৈহাটিতে পাঠালেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মন্মথনাথ বসু ছোট ভাই সমরেশের চাইতে কুড়ি বছরের বড় এবং তিনি ততদিনে ভারতীয় রেলের একজন চাকুরিজীবী কর্মচারী। নৈহাটিতে এসেও কমেনি সমরেশের দুরন্তপনা। তবে সেসময় তাঁর গুণের মধ্যে অন্যতম ছিল থিয়েটারে অভিনয় ও গানবাজনা করা। সতেরো বছর বয়সে ভালোবেসে বিয়ে করে বসলেন বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দিদি তথা যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরী দেবীকে। এ বিষয়ে যে কথা মনে রাখার তা হল, গৌরী দেবী পূর্ব থেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন অন্যত্র; কিন্তু সেখানে স্বামীর সঙ্গে ঠিক মতো মধুর সম্পর্ক গড়ে না ওঠায়, শ্বশুরবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে এসেছিলেন বাপের বাড়িতে। তারপর ভাইয়ের বন্ধু সমরেশের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান এবং সমাজের কারোর তোয়াক্কা না করে বিয়ে করেন দুজনে। এ বিয়ে মেনে নেয়নি পুরানো সংস্কারমনস্ক দুপক্ষের কোনো পরিবারই। কাজেই দারিদ্রতা এবং দায়িত্বের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে একইসঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হয় নব বিবাহিত দম্পতিকে। দারিদ্রতার কঙ্কাল ঢাকতে ডিম বিক্রি করতে শুরু করলেন সমরেশ বসু। তাতেও যখন পেটের খোরাক মিটছে না তখন ঢাকেশ্বরী কটন মিলে লেবারের চাকরি করতে শুরু করলেন তিনি।

কখনো আধপেটা খেয়ে তো কখনো অনাহারে কেটেছে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই। বন্ধু এবং গবেষক সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ বসুর এই কষ্টের সঙ্গে লড়াই প্রসঙ্গে এক ডকুমেন্টারিতে জানাচ্ছেন,–

> "তিনি দৈনিক এক টাকা সতেরো পয়সা রোজে ইছাপুর মেটাল ফ্যাক্টরিতে ট্রেসারের কাজ শুরু করেন। এখানেই সত্যভূষণ দাশগুপ্ত ওরফে সত্য মাস্টারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সত্য মাস্টার ই তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' দিয়েছিলেন।"[৪]

অর্থাৎ পেটের রসদ জোগাড় করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমরেশের। এ অবস্থায় মনের রসদের টান পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু হৃদয় জুড়ে সাহিত্য সাধক হওয়ার বাসনাকে জিইয়ে রেখেছিলেন মনের গোপনে। আর গোপন এই বাসনায় স্ত্রী গৌরী দেবী তাঁকে সাধ্য মতো সাহায্য করে গিয়েছিলেন। লেখাকেই জীবিকা করুক স্বামী এজন্য সংসারে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে গৌরী দেবী গান শেখাতে শুরু করেছিলেন।

ঠিক এমনই এক সময়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৪৬ এর শারদীয় সংখ্যায় 'আদাব' এর হাত ধরে স্বপ্নের প্রথম নাগাল পেলেন সমরেশ। প্রথম ছোটোগল্পের খ্যাতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করছিল ততদিনে সাহিত্যিক মহলে। এছাড়াও নৈহাটি আতপুরের চটকল শ্রমিকদের জীবনকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। আতপুরের তরফদার পাড়ায় থাকাকালীন চটকলের মিস্ত্রি ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের সংস্পর্শে এসেছিলেন সমরেশ। দিন আনে দিন খায় এমন খেটে খাওয়া মানুষদের খুব কাছ থেকে লক্ষ করেছেন তিনি। তিনি নিজেও অবশ্য সে দলেরই একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখ। বন্ধনভীরু সমরেশ পারিবারিক, সামাজিক অনুশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুটে গেছেন সেই সব মানুষদের কাছে, যারা সমাজে অবহেলিত, অপাংক্তেয়– সভ্যতার আলো যাদের ধারে কাছেও পৌঁছায়নি। এমন সময় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ এর ২৬ মার্চ সরকারিভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। আর তাতেই সমরেশ বসু বেকায়দায় পড়লেন তাতে। কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছের লোক হওয়ার অপরাধে কলকাতার মেস বাড়ি থেকে ১৯৪৯ এ গ্রেফতার হলেন তিনি। নয় মাস জেল খাটার পর ফিরে এলেন, কেননা ১৯৫০ এর ২৭ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা হাইকোর্ট কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসম্মত বলে আদেশ জারি করে। আর এরপর থেকেই শুরু হয় সমরেশের নতুন ইনিংস,– কালকূট। তবে কালকূটের ছদ্মবেশটিকে বুঝতে গেলে আমাদের তাঁর পূর্ব কালকূট পর্বটিকে আরেক পশলা জেনে নিতে হবে।

৩

নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলের নথি অনুযায়ী ৬.২.১৯৩৯ এ সুরথনাথ নামে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন সমরেশ। প্রথাবদ্ধ পড়াশোনায় সমরেশ বসু উদাসীন ছিলেন; আর সেকারণেই অষ্টম শ্রেণির Examination Result Register এ Not promoted লেখাটি আজও বর্তমান। দাদা মন্মথনাথ সমরেশ সম্পর্কে বলেছিলেন "অনিচ্ছুক মেধাবী পড়ুয়া।"[৫] ছেলে পড়াশোনায় লবডঙ্কা প্রমাণিত হলে অভিভাবকেরাও হতাশগ্রস্ত হন। আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন সমরেশ কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই সিগারেটের প্রবল নেশা তাকে জড়িয়ে ধরে। অদৃষ্ট প্রদত্ত বেকারত্বকে স্বীকার না করে হাতে লেখা পত্রিকা "বাণী" প্রকাশ করেন। শুরু হয় সমরেশের লড়াকু জীবন। এই পত্রিকা চালাতে গিয়ে সমরেশ বসুকে লিখতে হয় অনেক গল্প। সেই গল্পগুলো যে 'খুবই পাকামী' তাও পরবর্তীতে স্বীকার করেছেন সমরেশ বসু। বড় বড় লেখা পড়ে সেই গল্পগুলো দাঁড় করাতেন বলেও স্বীকার করেছেন তিনি। দারিদ্রের ঘুণপোকা কুরে কুরে শেষ করতে চায় সমরেশের জীবনকে। এ অবস্থায় আতপুরে চটকলের আবদুল মিস্ত্রির বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে।

থিয়েটারে গান বাজনা ও অভিনয়ে উৎসাহী সমরেশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এই সময়ে। দাদা মন্মথনাথ বসুর আর্থিক সংকট এবং চিকিৎসার উদাসীনতার দরুন সমরেশ মৃত্যুর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হন। এই সময়েই বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের বড় দিদি গৌরী দেবীর (যিনি বিবাহিত এবং স্বামী বিচ্ছিন্না হয়ে বাপের বাড়িতেই

থাকতেন) সেবা, যত্ন এবং আর্থিক সাহায্যের দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠলেন। গৌরী দেবী নিজের গহনা বিক্রি করে দেবশঙ্করের সঙ্গে ছোট বোনের শ্বশুরবাড়ি উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে সমরেশকে পাঠিয়ে দিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। জল হাওয়ার গুণ ও গৌরী দেবীর নিঃস্বার্থ প্রেম সহচর হয় সমরেশের। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ এবং গৌরী দেবীর প্রেম সম্পর্কে বলেন, "এই প্রেমই তাঁর জীবনের চাকা ঘুরিয়ে দিল।"[৬]

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রাককালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয় সমরেশ বসুর। তাঁর কাছ থেকে তিনি পেলেন 'জনযুদ্ধ' এর মন্ত্রশক্তি, উদ্বুদ্ধ হলেন মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায়। শ্রী বসু নিজমুখে স্বীকার করেছেন, "সত্যমাস্টার আমার প্রথম রাজনৈতিক গুরু।"[৭] ফার্মবয়ের চাকরির সুবাদে সংসার স্বচ্ছল হতে শুরু করেছিল সবে, এমন সময় হঠাৎই সমরেশ বসুকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য খোয়াতে হল চাকরি। দিকভ্রান্ত অবস্থা আবার শুরু হয়, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ১৯৪২ এর ডিসেম্বর মাসে সমরেশ দৈনিক এক টাকা চার আনায় ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে 'ইন্সপেক্টর অব স্মল আর্মস' বিভাগে কাজ পান। স্বস্তি মেলে কিছুটা। ফিরে যেতে পারেন নিজের স্বপ্নের কাছাকাছি। নতুন করে আবার এক হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। 'বাণী'র চাইতে এই পত্রিকার নতুনত্ব হিসেবে কমিউনিজমের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতাদর্শ কোনদিনই সমরেশের পরিবারকে প্রভাবিত করেনি। সমরেশের মেসোমশাই বগলাপ্রসন্ন গুহ টেররিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পার্টি ভাগ হবার পর সি.পি.আই.এম এ এসেছিলেন এবং আমৃত্যু এই পার্টির সদস্য ছিলেন। এসময়ে 'উদয়ন লাইব্রেরী' নামে একটি পাঠাগার গড়ে তুলে সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্য সাধনাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যান। তাঁর ছিল অসম্ভব রকমের বই পড়ার ক্ষুধা। বই পড়ার দৌলতেই মার্ক্সবাদী সাহিত্য ধারার সঙ্গে তাঁর যোগ আরো নিবিড়তা লাভ করে। মার্ক্সবাদে দীক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সমরেশ বসুর অন্যতম প্রিয় লেখক। মানব মনের মধ্যে যে আঁধার চেতনার বোধে ধরা দেয় কিন্তু প্রকাশের আলোয় তেমন ধরা দেয় না; সেই সব চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন সমরেশ বসু। বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে জীবনের চাওয়া পূরণ হয় না অভাব ও বিভিন্ন দায়-দায়িত্বের মারপ্যাঁচে। কিন্তু সমরেশ বসু এ বিষয়ে ভাগ্যবান; কেন না মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চা তাঁর জীবনের রসদ পূরণে অনেকটা সমর্থ হয়। সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের অনুমতিক্রমে ১৯৪৪-৪৫ এ পান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। এর ঠিক পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪৬ এর শারদীয়া 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আদাব' ছোটগল্পটি। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে এই গল্পটিকেই সমরেশ বসুর রচিত প্রথম ছোটগল্প ধরে নেওয়া হয়। অন্যথায় তার প্রথম ছোটগল্প 'শের সর্দার' 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'আদাব' এর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনেক সমালোচক মনে করেন।[৭] 'আদাব' গল্পটি তথাকথিত পূর্বতন ছোটগল্পগুলি থেকে অন্যমাত্রার। ১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা এই ছোটগল্পটি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ মানবতার গল্প। 'আদাব' গল্পটির জনপ্রিয়তা এতটাই ছিল যে দ্বিতীয় গল্পটি তার পূর্বতন গল্পের সুনাম বজায় রাখতে পারবেন না বলে ভেবেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এজন্য 'ঈশানী' গল্পটিকে পত্রিকায় ছাপার জন্য মনোনীত না করে অন্য আরেকটি গল্প পাঠাতে অনুরোধ করেন এবং 'নতুন খোকা' গল্পটিকে মনোনীত করেন।

অর্থাৎ সমরেশ বসুর সাহিত্যে পদার্পণ বৃহৎ এক ধুমকেতুর আগমনের সমতুল্য। দেশভাগ এবং তার পরবর্তীতে বাংলার সমাজজীবনে নেমে আসে এক অসহ্যকর অবক্ষয়ের সময়। আর এই ঘন তিমিরাচ্ছন্ন দাঙ্গা-দেশভাগ-উদবাস্তু মানুষদের হাহাকারে ভরা পরিস্থিতিতে বাংলা ছোটগল্প খুঁজে পায় তার এক নবীন সাধককে। আগাগোড়া কমিউনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে গ্রেফতার হবার পরও হতাশ হননি। বরং জ্বলে উঠেছেন ফিনিক্স পাখির মতো। নয় মাস জেলে থাকা অবস্থায় লিখলেন 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস

(প্রথম প্রকাশ ১৯৫১), 'লেবার অফিসার' নামে একটি নাটক এবং 'ডাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'অকালবৃষ্টি' নামে একটি ছোটগল্প। 'উত্তরঙ্গ' প্রকাশের পর কবি বিষ্ণু দে একটি চিঠিতে সমরেশ বসুকে জানিয়েছিলেন, "আরো লিখুন, গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগরসঙ্গমে।"[৮] কাজেই ছদ্মনাম পূর্ববর্তী সময়েও সমরেশের গ্রহণযোগ্যতা কিংবা প্রকাশক্ষমতা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। সমরেশ বসু জেলে থাকাকালীন তাঁর সংসারে তীব্র টান পড়ে। স্ত্রী গৌরী দেবী ততদিনে চার সন্তানের মা। সন্তানদের মুখে খাবার দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। মরুভূমিতে মরীচিকা খুঁজে বেড়ানোর মতো অবস্থার সম্মুখীন হন তিনি। গান শেখানোর পুরানো কাজ দিয়ে আর চলে না সংসার। ভাবতে হয় নতুন পথ। কিন্তু পেটের জ্বালা মেটানোর জন্য টাকা রোজগারের কোনো পথ না পেয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে নিরুপায় গৌরী দেবী অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন। ডাঃ বি. সি. রায় সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাসোহারার মাধ্যমে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন গৌরী দেবীকে। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের বুকে সৌজন্যমূলক রাজনীতির এ এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল।

৪

একের পর এক উপন্যাস যখন নাম করছে তখনই তিনি ছদ্মনামের আশ্রয় নিলেন, নিজের পরিচয় গোপন রেখে নিজের কথাটি বিশ্বের কাছে প্রকাশের উদ্দেশ্যে। কমিউনিস্ট মতবাদী 'প্রবাহ' পত্রিকায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সংখ্যায় 'ভোটদর্পণ' নামে একটি পর্যালোচনা মূলক ফিচার লিখলেন। শুরু হল সমরেশ বসুর কালকূট পর্ব। চটকল এলাকায় সাধারণ নির্বাচনে কি হয় কি হয়! এরকম এক উত্তাল পরিবেশে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা পরিচালিত বাঙালি-অবাঙালির মধ্যে দাঙ্গার বিরোধিতা লেখাটির উপজীব্য। বোঝাই যায় সমরেশ বসুর রাজনৈতিক অবস্থান থেকে লেখাটির সূত্রপাত এবং ছদ্মনামের প্রয়োজনও স্পষ্ট। বাম রাজনীতির ব্যক্তিত্বদের এমন ছদ্মবেশ শাসনকর্তাদের কোপ এড়াতে সে সময়ে প্রয়োজন ছিল। তবে সমরেশ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কালকূট ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন বলে 'গাহে অচিন পাখি'তে জানাচ্ছেন তার তাৎপর্যের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত 'ভোটদর্পণ' এ নেই। কালকূট জীবনতীর্থের তীর্থযাত্রী। তাঁর ভ্রমণ ইতিহাস-পূরাণকে জানার জন্য নয়, মানুষকে জানার জন্য। এজন্যই 'আদাব' থেকে 'দেখি নাই ফিরে'র মধ্যিখানে সুরথনাথের কালকূট যাত্রাটি সমরেশের জীবনের পরশমণি।

তথ্যসূত্র:

১. কালকূট। কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৯।

২. কালকূট। কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১।

৩. দত্ত, বীরেন্দ্র। প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস। ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৬৯৭।

৪. Dutta, Rajesh. Samaresh Basu: A Documentry by Raja sen. https://youtu.be/g09IYSTzs6o?si=AHVmYEWh8vuTC96p প্রকাশের তারিখ: ১২ মার্চ ২০২০।

৫. চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য। সমরেশ বসু: স্মরণ ও সমীক্ষণ, জীবনপঞ্জী। কলকাতা, ১৯৯১-৯২, পৃ. ৫৬৮।

৬. মিত্র, মনোতোষ। জীবনশিল্পী সমরেশ বসু। কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ. ১১।

৭. বসু, নিতাই। সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৯, পৃ. ১২-১৩।

৮. ঘোষ, সাগরময় সম্পাদনা। দেশ। ৫৫ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৪ মে ১৯৮৮, কলকাতা, পৃ. ৩২।